বাংলাদেশ কোল পলিসি (প্রস্তাবিত)

পলিসি না প্রসপেক্টাস

প্রফেসর এম. শামসুল আলম

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগের সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত তারিখবিহীন একটি পত্রে ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ তারিখে বাংলাদেশ কয়লানীতির (বাংলাদেশ কোল পলিসি) ওপর আয়োজিত ওয়ার্কশপে আমন্ত্রণ জানানো হয়। চিঠিতে বলা হয়, পরিকল্পনা মাফিক কয়লা খাতের উন্নয়নের জন্য খসড়া কয়লানীতি প্রণীত হয়েছে। আয়োজিত ওয়ার্কশপে এর ওপরই আলোচনা। খসড়াটি দেখেই মনে হয় এটি একটি প্রসপেক্টাস, পলিসি নয়। বিদেশী কোম্পানির কাছে কয়লা বিক্রির প্রয়োজনে তাদের আকর্ষণ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। যেমনটি বসুন্ধরা, আশুলিয়া, মধুমতি- এসব জায়গায় প্লট ও ফ্ল্যাট বিক্রির জন্য ক্রেতাদের আকর্ষণ করতে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা উল্লেখ করে প্রসপেক্টাস তৈরি করা হয়।

কয়লানীতির প্রথমেই বলা হয়েছে, নবেম্বর ২০০৫ সাল নাগাদ প্রমাণিত ও সম্ভাব্য অবশিষ্ট মজুদ গ্যাসের পরিমাণ প্রায় ১৩.৭৫ টিসিএফ। এ পরিমাণ গ্যাস দিয়ে বড় জোর ২০১১ সাল পর্যন্ত জ্বালানি চাহিদা মেটানো যেতে পারে বলে ধারণা করা হয়েছে। খসড়া নীতিতে আরো বলা হয়েছে, ৫.৫%- ৭.০% পর্যন্ত জিডিপি বৃদ্ধির হিসাব বিবেচনায় নিলে তাতে জ্বালানি চাহিদা যে হারে বৃদ্ধি পাবে, সেজন্য ১৬-২৬ টিসিএফ গ্যাসের সমতুল্য জ্বালানি ঘাটতি দেখা দেবে। এই বিশাল জ্বালানি চাহিদা পূরণে কয়লার কোনো বিকল্প নেই। তাই জাতীয় অর্থনীতিতে গ্যাসের পাশাপাশি কয়লা এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি।

খসড়া কয়লানীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উত্তোলনযোগ্য কয়লার পরিমাণ ১৪০০ মিলিয়ন (মেট্রিক) টন অর্থাৎ ৩৭ টিসিএফ গ্যাসের সমতুল্য। কয়লানীতির 'এনেক্স-এ'তে ২০২৫ সাল নাগাদ কয়লা উৎপাদনের প্রক্ষেপণ দেখানো হয়েছে এবং তাতে দেখা যায়, সব কয়লা খনি লিজ দেয়া হচ্ছে, এমনকি অনাবিষ্কৃত খনিও। বড়পুকুরিয়া থেকে ৪.৭৫ মেট্রিক টন সুড়ঙ্গ খনন পদ্ধতিতে উৎপাদনের পর যদি সফল সমঝোতা হয়, তাহলে উন্মুক্ত খনন পদ্ধতিতে টাটা উত্তোলন করবে। ২০১০ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ১১১.৫ মেট্রিক টন। সেখানে উত্তোলনযোগ্য মজুদের পরিমাণ ২৭০ মেট্রিক টন। তাছাড়া খালাসপির খনির কয়লা সুড়ঙ্গ খনন পদ্ধতিতে হোসাফকে এবং ফুলবাড়ী খনির কয়লা উন্মুক্ত খনন পদ্ধতিতে উত্তোলনের জন্য এশিয়া এনার্জিকে লিজ দেয়া হয়েছে। এশিয়া এনার্জি ২০০৮ সালে উন্মুক্ত খনন পদ্ধতিতে ১ মেট্রিক টন উৎপাদন করবে এবং ক্রমান্বয়ে প্রতি বছর তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩ সাল থেকে বিরামহীনভাবে প্রতি বছর ১৬ মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদন করবে। ২০২৫ সাল নাগাদ তাদের উত্তোলনের পরিমাণ দাঁড়াবে ২৪২ মেট্রিক টন। সেখানে উত্তোলনযোগ্য কয়লার পরিমাণ ৪৫০ মেট্রিক টন। দুটি নতুন ফিল্ড যা এখনো আবিষ্কার হয়নি, তাও যথাক্রমে ২০১২ এবং ২০১৫ সালে লিজ দেয়া হবে উল্লেখ রয়েছে। তবে কারা লিজ পেয়েছে বা পাবে তা উল্লেখ না থাকলেও এ অনাবিষ্কৃত দুটি খনি থেকে কয়লা উৎপাদন শুরু হবে যথাক্রমে ২০১৬ এবং ২০১৯ সাল থেকে। কী পদ্ধতিতে উত্তোলন হবে তা বলা না হলেও ২০২৫ সাল নাগাদ এ দুটি খনি থেকে উৎপাদিত কয়লার পরিমাণ হবে যথাক্রমে ৮৩ ও ৫৩ মেট্রিক টন। কিন্তু খনি দুটি আবিষ্কার না হওয়ায় সেখানে কত মেট্রিক টন উত্তোলনযোগ্য কয়লা মজুদ আছে তা উল্লেখ করা যায়নি। দীঘিপাড়া কয়লা খনি এখনো লিজ দেয়া না হলেও ২০১১ সালে লিজ দেখানো হয়েছে। কাকে লিজ দেয়া হবে তা উল্লেখ না থাকলেও উক্ত খনি থেকে ২০১৪ সালে ২ মেট্রিক টন হিসাবে উন্মুক্ত খনন পদ্ধতিতে উত্তোলন শুরু হবে এবং প্রতি বছর তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সাল থেকে ৮ মেট্রিক টন হিসেবে বিরামহীনভাবে প্রতি বছর উত্তোলন হবে এবং ২০২৫ সাল নাগাদ উত্তোলনকৃত কয়লার পরিমাণ হবে ৮৪ মেট্রিক টন। সেখানে উত্তোলনযোগ্য মজুদ কয়লার পরিমাণ ১৪০ মেট্রিক টন। এশিয়া এনার্জি ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প উন্নয়ন পরিকল্পনায় উন্মুক্ত খনন পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের যে প্রস্তাব সরকারের কাছে পেশ করেছে তা এখনো অনুমোদিত না হওয়া সত্ত্বেও উন্মুক্ত খনন পদ্ধতিতে খুলবাড়ী খনি থেকে এশিয়া এনার্জি কয়লা উৎপাদনের জন্য লিজ পেয়েছে বলে নীতিতে উল্লেখ আছে।

জ্বালানি নিরাপত্তার প্রশ্নে এ নীতিতে বলা হয়েছে, দ্রুত কয়লা খাত উন্নয়ন করে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই লক্ষ্য। সে জন্য পরবর্তী ১০ বছরের মধ্যে বছরে ২০ মেট্রিক টন বা তার অধিক কয়লা উৎপাদন নিশ্চিত করে তা থেকে কমপক্ষে ৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জন করা হবে এবং আগামী ২০ বছরে নিয়মিত ৪০ মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদন নিশ্চিত করা হবে। সে অনুযায়ী 'এনেক্স-এ' তৈরি করা হয়েছে এবং তাতে দেখা যায় ২০১৭ সালেই অর্থাৎ আজ থেকে ১২ বছর পর থেকে উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে প্রতি বছর ৪১ মেট্রিক টন এবং ২০২২ সাল থেকে প্রতি বছর ৫৭ মেট্রিক টন। জ্বালানি নিরাপত্তার প্রশ্নে আরো বলা হয়েছে, কমপক্ষে ৫০ বছর দেশের জ্বালানি চাহিদা মেটাতে কয়লার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হবে। যদি তার আগেই কয়লা শেষ হয়ে যায় তাহলে সরকার বিশেষভাবে নতুন কয়লা খনি আবিষ্কারের চেষ্টা চালাবে।

কয়লা রপ্তানির প্রশ্নে এ নীতিতে বলা হয়েছে, বিনিয়োগকারীকে কয়লা রপ্তানি করতে দেয়া হবে এবং এ রপ্তানি নিয়ন্ত্রিত হবে বিনিয়োগকারী কর্তৃক স্থানীয়ভাবে কয়লা ব্যবহারের দ্বারা। উৎপাদনের প্রথম দিকে উৎপাদিত কয়লার ৩ ভাগের ২ ভাগ রপ্তানি হবে এবং পরবর্তীতে উৎপাদনের অর্ধেক রপ্তানি হবে। লিজ গ্রহীতা কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কয়লা বাজারজাত করবে এবং কয়লাভিত্তিক শিল্প কলকারখানার মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে কয়লার ব্যবহার বৃদ্ধি করবে।

কয়লা খাতের মাস্টার প্ল্যান সম্পর্কে নীতিতে বলা হয়েছে, বার্ষিক ৪০ মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সময়মতো পরিকল্পনা মাফিক কয়লাভিত্তিক শিল্প ও কলকারখানা তৈরির জন্য কয়লা খাতের মাস্টার প্ল্যান প্রণীত হবে। তবে দেশের জ্বালানি প্রাপ্যতাও বিদুৎতের চাহিদা পূরণ কল্পে বিদ্যুৎ খাতের মাস্টার প্ল্যান ও গ্যাস খাতের মাস্টার প্ল্যানকে বিবেচনায় নিতে হবে। তবে এ মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, স্থানীয় বাজারের সীমাবদ্ধতার কারণে কয়লা উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ কয়লা বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগকৃত বিপুল পরিমাণ অর্থ উদ্ধারের প্রয়োজনে রপ্তানির সুযোগ দিতে হবে এবং কয়লা রপ্তানি কমিয়ে আনা যাবে যখন স্থানীয় বাজারে কয়লার বাজার সৃষ্টি হবে।

এ নীতি অনুযায়ী বিনিয়োগকারী সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পরই সিদ্ধান্ত নেবে কয়লা উত্তোলন উন্মুক্ত খনন পদ্ধতিতে হবে, না সুড়ঙ্গ পদ্ধতিতে হবে। লিজ গ্রহীতা পরিবেশ সংক্রান্ত বিচার নিশ্চিত করবে। কয়লা উত্তোলন, উৎপাদন, উন্নয়ন ও বিপণনের জন্য প্রাইভেট বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পাবলিক বিনিয়োগের সুযোগ রাখা হয়নি। রপ্তানির ক্ষেত্রে কয়লার মূল্য নির্ধারণ করবে লিজ গ্রহীতা আন্তর্জাতিক কয়লার মূল্যসূচক অনুযায়ী। রপ্তানিকৃত কয়লার ক্ষেত্রে যদি কয়লা খনন উন্মুক্ত পদ্ধতিতে হয় তাহলে রয়্যালটি হবে ৬% এবং সুড়ঙ্গ পদ্ধতি হলে হবে ৫%। সেই সঙ্গে পরিবর্তনশীল উপাংশ হিসেবে রয়্যালটিতে একটি ক্ষুদ্র অংশ যুক্ত হবে। তা নির্ভর করবে

আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিটন কয়লার দর ওঠা-নামার ওপর। এর প্রভাব মূল রয়্যালটিতে খুব সামান্য। তাছাড়া স্থানীয়ভাবে ব্যবহৃত কয়লার ক্ষেত্রে এ পরিবর্তনশীল উপাংশ থাকবে না। টনপ্রতি কয়লার মূল্য নীতিতে নির্ধারণ করা হয়নি। তবে সে মূল্য যাই হোক, তা পরিশোধিত হবে বাংলাদেশী মুদ্রায়। মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইনিং প্রকৌশলে ডিগ্রি কোর্স চালু হবে এবং পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলো মাইনিং কোর্সে ডিপ্লোমা চালু করবে। দক্ষ কারিগর তৈরির জন্য ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলোও প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করবে। সব লিজ গ্রহীতাই তাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মাইনিং প্রকৌশল ও প্রযুক্তির ওপর স্নাতক, ডিপ্লোমাধারী, টেকনিশিয়ান ও শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেবে। কয়লা খনি উন্নয়ন সম্পর্কিত একটি গবেষণা কেন্দ্র সরকারের জ্বালানি বিভাগের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হবে। এসব প্রয়াস কয়লা উৎপাদনে সহায়ক মানবসম্পদ তৈরির, যা অতীতে কখনো দেখা যায়নি।

এ নীতিতে বলা হয়েছে, উন্মুক্ত খনন পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনে বিশাল কৃষি জমির ক্ষতি হবে, বহু মানুষ ভিটে-মাটি ছাড়া হবে এবং কৃষি উৎপাদনে বিপুল ক্ষতি হবে। তবে এ ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করা হবে বলে নীতিতে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তার পরিমাণ কীভাবে নির্ধারিত হবে এবং যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তারা যদি ক্ষয়ক্ষতি মেনে না নেন, তাহলে কী হবে নীতিতে তা উল্লেখ নেই। যদিও নীতিতে উল্লেখ আছে খনি খনন উন্মুক্ত, না কি সুড়ঙ্গ পদ্ধতিতে হবে তার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পর বিনিয়োগকারী সিদ্ধান্ত নেবে। অথচ নীতিতে উত্তোলনযোগ্য কয়লার পরিমাণ ১৪০০ মেট্রিক টন উল্লেখ করে এনেক্স-এ কয়লা উত্তোলনের যে পরিকল্পনা দেখানো হয়েছে তাতে বোঝা যায়, শুধু উন্মুক্ত খনন পদ্ধতিতেই কয়লা উত্তোলনের দ্বারা উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হবে। সে ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা যাচাই, লিজ প্রদান, এমনকি কয়লা খনি আবিষ্কারেরও প্রয়োজন হয়নি। সুতরাং এ নীতি কোনোভাবেই পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় সহায়ক নয়, বরং তা ধ্বংস করার ক্ষেত্রে এটি একটি ধারালো অস্ত্র বলাই শ্রেয়। যা ব্যবহার হবে উন্মুক্ত খনন পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন ও রপ্তানি নিষ্কন্টক করার ক্ষেত্রে।

১৯৯৫ সালের জাতীয় জ্বালানি নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল জ্বালানি অবকাঠামো নির্মাণ করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং আর্থ-সামাজিক গ্রুপের জ্বালানি চাহিদা মেটানো তথা জ্বালানি নিরাপত্তা ধারাবাহিকভাবে নিশ্চিত করা। ২০০৪ সালে জ্বালানি নীতি হালনাগাদ করার জন্য খসড়া প্রণয়ন করা হয়। তাতে ২০২০ সাল নাগাদ সবার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। খসড়া কয়লানীতিতে উল্লিখিত তথ্য মতে, ২০২৫ সাল নাগাদ গ্যাসের ঘাটতির পরিমাণ ২৬ টিসিএফ।

জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টি এ নীতিতে থেকে গেছে দারুণভাবে উপেক্ষিত। সুতরাং যে কয়লানীতি জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তাকে নিরাপত্তাহীন করে বিদেশে কয়লা বেচে দেয়ার সুযোগ করে দেয়, তাকে আমরা কোনোভাবেই নীতি বলতে নারাজ। জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের এ খসড়া কয়লানীতিকে আমরা বিদেশীদের কাছে কয়লা বিক্রি করার প্রয়োজনে প্রণীত একটি ‘প্রসপেক্টাস’-এর খসড়া বলাই শ্রেয় মনে করি

যদি টাটাকে ৩.২৫ টিসিএফ গ্যাস সরবরাহের নিশ্চয়তা দেয়া হয় তাহলে এ ঘাটতি ৩০ টিসিএফের দাঁড়াবে। আর সে ক্ষেত্রে ২০২০ সাল নাগাদ যদি সবার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হয় তাহলে এ ঘাটতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? বর্তমানে ৩০% জনসাধারণকে বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতায় আনা হয়েছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী গত বছর বিদ্যুৎ ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৮০০ মেগাওয়াট। সুতরাং জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহার নিশ্চিত করতে না পারলে ২০২৫ সালের মধ্যে জ্বালানি ঘাটতি দাঁড়াবে কমপক্ষে ২৫-৩০ টিসিএফ এবং জ্বালানি নিরাপত্তা হবে দারুণভাবে সঙ্কটাপন্ন। সেই অবস্থায় ২০২৫ সালের মধ্যেই উত্তোলনযোগ্য কয়লার অর্ধেকের বেশি (প্রায় ১৮ টিসিএফ) উত্তোলন করা হবে এবং তার সিংহভাগ রপ্তানি করে বিদেশী বিনিয়োগকারীর স্বার্থ রক্ষা করা হবে এমন ব্যবস্থাই এ খসড়া নীতিতে রাখা হয়েছে। জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টি এ নীতিতে থেকে গেছে দারুণভাবে উপেক্ষিত। সুতরাং যে কয়লানীতি জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তাকে নিরাপত্তাহীন করে বিদেশে কয়লা বেচে দেয়ার সুযোগ করে দেয়, তাকে আমরা কোনোভাবেই নীতি বলতে নারাজ। জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের এ খসড়া কয়লানীতিকে আমরা বিদেশীদের কাছে কয়লা বিক্রি করার প্রয়োজনে প্রণীত একটি ‘প্রসপেক্টাস’-এর খসড়া বলাই শ্রেয় মনে করি। উল্লেখ্য যে, ভারতের মজুদ কয়লার পরিমাণ ৬০ হাজার ৬৮৪ মেট্রিক টন। প্রতিবছর উত্তোলন হয় মজুদের ০.৫৩%। উন্মুক্ত পদ্ধতিতে উত্তোলন করা হলে এ কয়লার মজুদ শেষ হতে সময় লাগবে প্রায় ১৯০ বছর। স্বাভাবতই প্রশ্ন ওঠে, ভারত তার এ মজুদ কয়লা দ্রুত উত্তোলন করে চাহিদা না মিটিয়ে দ্রুত নিউক্লিয়ার জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে যাচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশ থেকে জ্বালানি আমদানির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং নেপালের পানি বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করছে- কেন? জ্বালানি চাহিদা মেটাতে জ্বালানি আমদানির ১০০ বছরের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে- কেন? আর সে ক্ষেত্রে আমরা আমাদের জ্বালানি চাহিদা ও জ্বালানি নিরাপত্তাকে উপেক্ষা করে কোন বিবেচনায় কম দামে জ্বালানি রপ্তানির মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করে বিদেশীদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং কয়লানীতির নামে প্রসপেক্টাস বানাচ্ছি? অবশ্য যদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষের অর্থ প্রাপ্তির কারণ হয়, তাহলে আর কোনো কথা থাকে না।

২০০৩-০৪ অর্থবছরের তথ্যে দেখা যায়, এ সময়ে ব্যবহৃত কয়লার পরিমাণ ছিল ০.৮৫ মেট্রিক টন। এ কয়লার পুরোটাই আমদানিকৃত এবং ইটভাটায় ব্যবহৃত। বড়পুকুরিয়ায় সম্প্রতি ২৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লাচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয়েছে। এতে বছরে মোট কয়লার চাহিদা ০.৭০ মেট্রিক টন। আগামীতে এ চাহিদা বৃদ্ধির কোনো রূপরেখা কয়লানীতিতে নেই। বিগত এক যুগেও জাতীয় জ্বালানিনীতির লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়নি। কারণ জ্বালানি অবকাঠামো তৈরি এবং জ্বালানি খাতে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার ব্যাপারে সরকারের কোনো উল্লেখযোগ্য সফলতা নেই। এ দীর্ঘ এক যুগ ধরে সরকার ব্যস্ত ছিল গ্যাস রপ্তানিতে। এখন ব্যস্ত কয়লা রপ্তানিতে। এ খসড়া কয়লানীতি তারই প্রমাণ। কয়লানীতি জাতীয় জ্বালানি নীতির পরিপূরক হতে হবে এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। কিন্তু খসড়া কয়লানীতিতে দেখা যায়, এ নীতি জাতীয় জ্বালানি নীতির লক্ষ্য অর্জনে বিরাট প্রতিবন্ধক। জ্বালানি অবকাঠামো নির্মাণ এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও জনশক্তি গড়ায় কালক্ষেপণে স্থানীয় কয়লা বাজার সৃষ্টি বিলম্বিত হলেই কয়লা রপ্তানি বাড়ানো যাবে এবং বিদেশী কোম্পানিগুলোর স্বার্থ রক্ষা ও উদ্দেশ্য সফল হবে। এ খসড়া নীতিতে স্থানীয় কয়লার বাজার সৃষ্টি যাতে না হতে পারে সে ব্যবস্থাই নেয়া হয়েছে। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, সরকারকে কয়লা ও গ্যাস রপ্তানির চেষ্টা থেকে বিরত না রাখতে পারলে জ্বালানি অবকাঠামো তৈরি ও জ্বালানি খাতে দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং জনশক্তি গড়ে তোলা কোনোভাবেই সম্ভব হবে না। সে জন্য আইন করে কয়লা ও গ্যাস রপ্তানি করা জরুরি। তাহলেই জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অবশ্যই আমরা আমাদের জ্বালানি সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হবো।

লেখক: পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব এনার্জি টেকনোলজি, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।